বাংলা উপন্যাসে শ্রমিকশ্রেণি ঃ একটি বীক্ষণ

চন্দ্রিমা বসু*

মূল কথা ঃ বাংলা উপন্যাসে শ্রমিক শ্রেণি জীবিকা হিসেবে কিভাবে মানব চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নির্মাণ করেছে এবং শ্রমিক শ্রেণির বৈশিষ্ট্য উপন্যাস গঠনে কিভাবে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে - তা নির্বাচিত কয়েকটি এই গোত্রভুক্ত উপন্যাস অবলম্বনে আলোচিত হয়েছে। এই ধরনের উপন্যাসের পরিচয় দান ঘটেছে এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে।

একনজরে ঃ শ্রমিকশ্রেণির বাংলা উপন্যাসে ভূমিকা গ্রহণ ও তার বৈশিষ্ট্য অণ্বেষা।

"উঠ জাগ শ্রমজীবী ভাই
উপস্থিত যুগান্তর চল চল নারী নর
ঘুমাবার আর বেলা নাই
উঠ জাগ ডাকিতেছি তাই।"

১৮৭৪ সালের মে মাস থেকে 'ভারত শ্রমজীবী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের যে উদ্যোগ নেন ব্রাহ্মসমাজের শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ পত্রিকারই প্রথম সংখ্যায় বিশিষ্ট ব্রাহ্ম শিবনাথ শাস্ত্রী বাংলার শ্রমজীবী এবং তার জাগরণ নিয়ে প্রথম কবিতা লেখেন। উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি সেই কবিতারই অংশ। উনিশ শতকের মধ্যভাগের ইউরোপে শ্রমিক শ্রেণির বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধিতে শ্রমজীবীদের নিয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করার ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। ১৮৪৭ সালের জুন মাসে লন্ডন এ গড়ে ওঠে 'দ্য কমিউনিষ্ট লীগ'। আর বাংলায় রামমোহনের রচনায়, কেশব সেনের 'সুলভ সমাচারে' কৃষক ও শ্রমিকদের উন্নতিবিধান বিষয়ে বেশ কিছু ভাবনার আত্মপ্রকাশ খুঁজে পাওয়া যায়। এই ধরনের ভাবনায় ব্রাহ্ম সমাজই প্রথম সচেতন হয়েছিলেন এবং ঐ সমাজের শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বরানগর চটকল শ্রমিকদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন ১৮৬৬ সাল নাগাদ। এরপর ১৯৩৭ সালের শ্রাবণ মাসে লিখিত 'ছড়ার ছবি' কাব্যগ্রন্থে 'মাধো' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি লাইনে শ্রমিক বা মজুরের শ্রেণিচরিত্র এঁকে দিলেন অতিস্পষ্টতায় —

"এমন সময় নরম যখন হল পাটের বাজার
মাইনে ওদের কমিয়ে দিতেই, মজুর হাজার হাজার
ধর্মঘটে বাঁধল কোমর, সাহেব দিল ডাক,
বললে, মাধো, ভয় নেই তোর, আলগোছে তুই থাক।
দলের সঙ্গে যোগ দিলে শেষ মরবি যে মার খেয়ে।
মাধো বললে, মরাই ভালো এ বেইমানির চেয়ে।"

*সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ, নদীয়া

বস্তুতপক্ষে জমির বন্ধন থেকে মুক্ত, সম্পত্তিহীন স্বাধীন একদল মানুষ খালি হাতে তাদের শ্রমশক্তি নিয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে বা কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের আশায় কলকারখানার দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়— শ্রেণিগতভাবে মজুরি প্রাপ্তিতে তারা শ্রমিক নামে পরিচিত হয়ে যায়। আসলে একজন মানুষ তার জীবনকে চালনা করার জন্য কোন না কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। আর তার ভিত্তিতেই 'জীবিকা'র ধারণাও জন্ম নেয়। সভ্যতা বিস্তারের আদিস্তরে পশুপালন ছিল প্রধানতম জীবিকা। পরবর্তী সময়ে কৃষিকাজ গুরুত্ব পায়। উদ্বৃত্ত উৎপাদন শুরু হওয়ায় দাস শ্রম প্রচলিত হওয়ার মাধ্যমে সমাজে ক্রমশ শ্রেণিবিভাগও স্পষ্টতর হতে শুরু করে। হাতিয়ারের ক্রম উন্নতিতে শ্রমবিভাগও আরও প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে এবং স্বাভাবিকভাবেই কৃষি সহায়ক নানা পেশা যেমন ধাতুশ্রমিক, কাঠ শ্রমিক (ছুতোর), চর্মশ্রমিক সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজের শ্রমিকের আবির্ভাব ঘটে। শ্রমিক বা শ্রমজীবি তাই জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রাচীনতম পেশা হিসেবে চিহ্নিত। বৈদিক যুগে দাসেদের উদ্ভব এবং তাদের শ্রমে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য পুরোহিত এবং যোদ্ধাদের ভোগের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় সমাজ জীবনে শ্রেণিবিভাজন এবং তারই সঙ্গে জাতিভেদ প্রথার সূচনা করেছিল। ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের পুরুষ সূক্তে সমাজের যে বর্ণের কথা বলা হয়েছে তা একসময়ে শ্রেণির সঙ্গে সমার্থক হয়ে গেছে। ফলে সর্বাপেক্ষা নিচ জাতিতে থাকা শূদ্ররা হল শ্রমজীবি,—এমনকি সমাজের বৈশ্যরাও কৃষিজীবি ছিল, এবং এই দুই শ্রেণির শ্রমে উৎপাদিত উদ্বৃত্তের দ্বারাই জীবনধারণ করত উচ্চতম বর্ণের রাজন্য বা পুরোহিতবর্গ। অথচ সমাজের প্রধান উৎপাদক শ্রেণি শূদ্ররা কৃষিমজুর এবং অন্যান্য কায়িকশ্রমের সঙ্গে যুক্ত থেকে সমাজের চোখে হীনতর রূপে প্রতিপন্ন হয়েছে। গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস তাঁর 'ইন্ডিকা' বইটিতে তৎকালীন সমাজের সাতটি বৃত্তি বা পেশার উল্লেখ করে সামাজিক শ্রেণি-বিন্যাস করেছিলেন। এই সাতটি পেশা হল —দার্শনিক, কৃষক, পশুপালক, কারিগর, সেনানী, পরিদর্শক এবং সভাসদ। শ্রমজীবি মানুষের পেশা 'কারিগর' কে উল্লেখ করতে ভোলেননি মেগাস্থিনিস। ফলে বিভিন্ন সময়ে, অর্থাৎ সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্কের ধারায় — আদিম যৌথ সমাজ ব্যবস্থা, দাসপ্রথা, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, ধনতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্রের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে জীবিকার রূপরেখাও। তাই পেশা বা জীবিকা নিঃসন্দেহে কমবেশি ব্যক্তিচরিত্রকে প্রভাবিত করে। জীবিকার আলোয় সেই জীবনকেই নতুন তাৎপর্যে দেখতে চায় লেখক। অন্যান্য পেশার মত 'শ্রমিক শ্রেণি'ও তাই বাংলা উপন্যাসে জীবিকার বিশিষ্টতাতে, তার পারিপার্শ্বিকতা, তার সংগ্রাম, দ্বন্দ্ব, ব্যক্তি-সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের নিরিখে ব্যক্তিচরিত্রের স্বরূপকে স্পষ্ট করে তোলে।

মানুষ যে সমাজে বাস করে, সে সমাজে, তার চারপাশে উৎপাদন, উৎপাদনের ব্যক্তি মালিকানা, উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে যে বিরোধ, দ্বন্দ্ব ক্রমাগত চলে এবং একজন মানুষকে তা যেভাবে স্পর্শ করে তা সাহিত্য, শিল্পে প্রকাশিত ব্যক্তি চরিত্রে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। ব্যক্তি চরিত্র তখন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে হয়ে ওঠে শ্রেণিচরিত্রের প্রতিনিধিত্বকারী। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়ক বা রবীন্দ্রনাথের নায়কেরা মূলত সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি। আধুনিক যুগে পুঁজিবাদী সমাজে কর্তৃত্বকামী অংশ হিসেবে শ্রমিকশ্রেণি কর্তৃত্বকারী শ্রেণির সঙ্গে অবিরাম সংঘাত ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে এবং এই দ্বন্দ্ব, বিরোধে শ্রমিকশ্রেণি সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে সমাধানের জন্য সংগ্রামকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবে। শ্রমিকশ্রেণির এই সংগ্রামী তথা বিপ্লবী চরিত্রের দিকটি হচ্ছে তার বিশেষত্বের দিক। আধুনিক সাহিত্যে বাস্তববাদী লেখকের কাছে শ্রমিকশ্রেণি এবং তাদের কার্যকলাপ সবচেয়ে উদ্দীপক ও প্রেরণাদায়ক বলে প্রতিভাত হয়। এই ভাবনা নিয়েই গোর্কি, লু-সুন, শলোখভ, পাবলো নেরুদা, ব্রেখ্‌ট্‌ প্রমুখরা নতুন সাহিত্য উপহার দিয়েছেন। কিন্তু "বাঙ্গালা ভাষায় শ্রমিক

সাহিত্যের খুবই অভাব। গত পঞ্চাশ বৎসরের জাতীয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিভিন্নমুখী উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইলেও দেশের শ্রমিক কৃষকদের জীবনযাত্রা, আর্থিক দূরবস্থা এবং সংগঠনের ভাবধারা লইয়া খুব কম লেখাই বাহির হইয়াছে।" এমন মূল্যায়ণ করেছিলেন ১৯৩৪ সালে ২/২ বাগবাজার স্ট্রিটের শ্রমিক পাবলিশিং হাউস থেকে শ্রমিক সাহিত্য সিরিজ এর প্রথম সংখ্যা বাঙ্গলার শ্রমিকের লেখক শ্রী রমণীরঞ্জন গুহরায়। অথচ ১৯৩১ সালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশিত উপন্যাস চৈতালী ঘূর্ণি পাই। ১৯৩৯-১৯৪০ - এক বছর ধরে মাসিক পত্রিকা অগ্রণীতে প্রকাশিত হয়েছে বিশু বিশ্বাসের উপন্যাস মজদুর। ১৯৪৪ এ বেরিয়েছে জ্যোতির্ময় রায়ের উদয়ের পথে। ১৯৪৫ এ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দর্পণ, ১৯৪৬ এ শ্রমিক নেতা মনোরঞ্জন হাজরা রচিত 'নবজীবনের পথে', ১৯৪৮ এ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের দু'খণ্ডের নবসন্ন্যাস, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ত্রিপর্ব উপন্যাসের তৃতীয় মোহনা, স্বাধীনতা উত্তরপর্বে সমরেশ বসুর বিটি রোডের ধারে, সওদাগর, ছিন্নবাধা ইত্যাদি উপন্যাস রয়েছে। একথা ঠিক যে উনিশ শতকের শেষের দিকে শ্রমিক শ্রেণির প্রতি বাঙালি মধ্যবিত্তের মনোযোগ আকৃষ্ট হতে থাকে। কিন্তু এই মনোযোগ বা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিপ্রতীপ অবস্থানে। কেন না একদিকে শ্রমিকর শ্রমশক্তির প্রতি ধনতন্ত্রের অবর্ণনীয় অবিচার, চাপিয়ে দেওয়া দুর্দশা আর তার থেকে পরিত্রাণের আশায় নানা আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ—বিদ্রোহ, ধর্মঘট এবং তা দমন করার জন্য মালিক শ্রেণির পক্ষ থেকে গৃহীত পদক্ষেপ ছাঁটাই, লকআউট, পুলিশী অভিযান ইত্যাদির প্রেক্ষিতে সমাজের নবোদ্ভূত এই শ্রেণিটির প্রতি, বিশেষ করে তাদের শোষণ ও দারিদ্র্যের শেষ সীমায় উপনীত জীবনের করুণ কাহিনি, বিদ্রোহী সত্তার প্রতি সহানুভূতি উদ্রেক করে। অপরদিকে উদাসীনতা ও বিরুক্তির অনুভূতি। এর কারণ হিসেবে দেখা যায় এদেশের শিল্প প্রসারের সময় বাঙালি শ্রমিকদের জায়গা নিতে থাকে বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা হিন্দিবাসী অবাঙালি শ্রমিকরা। এদের প্রতি একধরণের অবজ্ঞা, তাদের জীবনযাপন পদ্ধতির প্রতি তীর্যক দৃষ্টি (মেড়ো সম্বোধন, মদ্যপান, বাজারে মাতলামো, অপরিচ্ছন্নতা) বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির মধ্যে জন্ম নিতে থাকে। W.B.S.A. Judicial Dept. Police Br. January 1986, A6-11 এর রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে ভদ্রলোকেরা মিলের শ্রমিকদের "Unruly" ও 'noisy' স্বভাবের জন্য অভিযোগ জানাচ্ছে। কিন্তু শ্রমিকদের এই পরিস্থিতির জন্য পুঁজিপতিদের অপরিসীম লোভ, উদ্বৃত্ত শ্রমের সিংহভাগ আত্মস্থকরণ — ফলত কম মজুরি প্রদান অর্থাৎ সবমিলিয়ে অর্থনৈতিক শোষণই যে দায়ী সে বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। এ বিষয়ে ১৯২৮ সালের ৩১ অক্টোবর অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হল —

"Condemmned to life in slums......working long hours in closed & stuffy atmosphere & victims of drug shops, he is converted to something less than a human being. [This] Condition of life.....is incidental to the modern industrial system generally; but....in very few industries the disproportion between Profits and Wages is so striking as this. [The Jute industry]."

সামগ্রিক ভাবে শ্রমিকদের জীবন নিয়ে যে সমস্ত সাহিত্য রচিত হয়েছে তাতে শ্রমিকজীবন এবং সেই জীবনের সার্বিক চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি তাদের ইউনিয়ন, সংগঠন, তাদের প্রতি দমন-পীড়ন ইত্যাদিই গুরুত্ব পেয়েছে। ঐতিহাসিক দিক থেকে কালপঞ্জী অনুযায়ী দেখলে দেখা যাবে উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের তিরিশ থেকে চল্লিশ দশকের সময়কাল পর্যন্ত শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতির মনোভাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে — "রাজনীতিতে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার অনুপ্রবেশের ফলে স্বদেশি আন্দোলনের যুগে বেশিরভাগ শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত শিল্প কারখানায় দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও মালিকের নির্যাতনের কারণে আন্দোলন বৃদ্ধি

ISSN NO.-2454-1605

পায়। ১৯২০ সালের দ্বিতীয়ার্ধে শুধু বাংলাতেই ১১০টি "ধর্মঘট" সংঘটিত হয়। এরই সঙ্গে বাড়তে থাকে শ্রমিক ইউনিয়নের সংখ্যাও। ১৯২০ - ৪০টি, ১৯২১ - ৫৫টি এবং ১৯২২ - ৭৫টি ইউনিয়নে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী নেতারা নেতৃত্ব দিতেন। ১৯২৫ সালে লেবার স্বরাজ পার্টি ১৯২৮-এ ওয়াকার্স এ্যান্ড পিজ্যান্টস পার্টি, ১৯৩২-এ লেবার পার্টির উদ্ভবের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। বাংলা কথাসাহিত্যে শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তিও এই সময় থেকে ঘটতে থাকে। উপন্যাসেও শ্রমিক জীবনের দুরবস্থার জন্য ধনী পুঁজিপতিদের স্বার্থকে দায়ী করার মানসিকতা প্রধানত সমাজতান্ত্রিক ধারণার আগমনের ফলেই যে ঘটেছিল তা স্বীকৃত। এই প্রেক্ষাপটেই শ্রমিক বা শ্রমজীবী জীবিকা নির্ভর বাংলা উপন্যাসের স্বরূপ অন্বেষা। আলোচনার সুবিধার্থে তিনটি লক্ষণের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

- সংশ্লিষ্ট পেশা বা জীবিকার সঙ্গে লেখকের সংযোগ।
- ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির বা গোষ্ঠী জীবনের দ্বন্দ্ব।
- পেশাগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চরিত্র-চিত্রণ।

■ সংশ্লিষ্ট পেশা বা জীবিকার সঙ্গে লেখকের নিবিড় সংযোগঃ

যে কোন সাহিত্য-শিল্প লেখকের অভিজ্ঞতাপুষ্ট হবে একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু একজন উপন্যাসিক যখন 'শ্রমিক' এই পেশাকে কেন্দ্র করে চরিত্রচিত্রণ করেন তখন নিঃসন্দেহে শ্রমিক শ্রেণি, তার আন্দোলন - সংগ্রামকে সামগ্রিকভাবে তুলে ধরার জন্য প্রয়াসী হন। তাই এই পেশার নানা দিকের সঙ্গে লেখকের নিবিড় সংযোগের প্রকাশ তিনটি কোণ থেকে দেখানো যাতে পারে।

ক. প্রেক্ষাপট হিসেবে শ্রমিক-জীবনের ছবিঃ

অ. "লম্বা টানা খোলার চালের নিচে দুই সারি বাসা ....মাঝখানে একটা নর্দমা, একেবারে এ মুড়ো ও মুড়ো চলিয়ে গেছে। সমস্ত জায়গাটা ব্যাপিয়া একটা তুমুল অরাজকতা — উলঙ্গ, অর্ধ উলঙ্গ ছেলেমেয়েদের দল ছাগল, কুকুর, হাঁস, মুরগী, তাহাদের ছাড়া সব একসঙ্গে মিশিয়া গেছে। .....ঝগড়া, ইতর, গালাগালিতে কান পাতা যায় না। পাঁচ ছয়জন লোক নেশা করিয়া জটলা করিতেছে।" —নবসন্ন্যাস / বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

খ. "সেই ভোর না হতেই কারখানাটার বাঁশীটার কাঁপা কাঁপা বিশ্রী চিৎকার। .... কুলি বস্তির ধোঁয়াটে তেলচিটে আকাশটা আঁতকে ওঠে। ....ধড়ফড় করে উঠে ফুপ্‌রিগুলো থেকে অন্ধকার মুখে মানুষগুলো বেরিয়ে আসে ভয় খাওয়া আরশোলার মতো। .....কর্কশ, মোটা ঘুমজড়ানো কণ্ঠের গালাগালি আর খিস্তির তোড়ে বাতাস বিদীর্ণ হয়। .....কুলি-বস্তির ওপরে মাথা উঁচিয়ে থাকে বিরস কালো চিমনিগুলো মোটা মোটা উঁচানো গদার মত।" —বিটি রোডের ধারে / সমরেশ বসু

নবসন্ন্যাসের স্রষ্টা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কয়লাখনি অঞ্চলের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল স্বচক্ষে ধানবাদের কাত্রাসগড় কয়লাখনি অঞ্চল থেকে যেখানে লেখকের ভাই কর্মরত ছিলেন। আর সমরেস বসুর স্মৃতিতে অম্লান আতপুরের তরফদার পাড়ার বস্তিতে অতিবাহিত করা সেই নিদারুণ কষ্টের দিনযাপন। ঘুপচি

ঘরের পাশে 'কাঁচা নর্দমার দুর্গন্ধে দম বন্ধ করা' সেই সব কথা ছড়িয়ে আছে তাঁর শ্রমিক বস্তির বর্ণনায় বর্ণনীয়।

[সূত্র : সমরেশ বসু : 'নিজেকে জানার জন্যে / দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮২]

খ. ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান ঃ

শ্রমিক জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে কিংবা সমস্যার মোকাবিলায় লেখকের নিজস্ব দর্শন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। 'দর্পণ' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদ্য গ্রহণ করা রাজনৈতিক আদর্শের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই পাঠকের উপলব্ধি হয়, কারণ বামপন্থী রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধির প্রক্রিয়াতেই তিনি ১৯৪৪ এ পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন এবং ঠিক তার বছর দুয়েক আগে অর্থাৎ এপ্রিল ১৯৪২ - জুন ১৯৪৩ -এই সময়ে পাটনা থেকে 'প্রভাতী' পত্রিকায় উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ফলে ঝামুরিয়া গ্রাম আর কলকাতা শহরের গল্পের আধারে যে শ্রমজীবী জীবন উঠে আসে তার পেছনে সেই মতাদর্শগত মানসিকতা উপস্থিত যে ছিল - সে কথার সমর্থন মেলে অধ্যাপক সরোজ দত্তের 'ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' এই গ্রন্থে — "যে উপন্যাসে বিক্ষোভ, প্রতিরোধ, সংগঠন, সমাবেশ, মিছিল, সংঘর্ষ, একের পর এক এসে গিয়েছে মার্কসবাদের সূত্র মেনেই।" আবার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় "আমার সাহিত্য জীবন"-এ 'চৈতালী ঘূর্ণি' সৃষ্টির পেছনে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলেন। সেই সময়ে অর্থাৎ বিশের দশকে সক্রিয় গান্ধীবাদী তারাশঙ্কর উপন্যাসের শেষপর্বে দুই চাকুরে বাবু যথাক্রমে সুরেন ও শিবকালীর উদ্যোগে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিক ইউনিয়ন তৈরি ও ধর্মঘট শুরুর কথা বলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই দুই চাকুরে বাবুই কিন্তু গান্ধীবাদী। মনোরঞ্জন হাজরা নিজেই শ্রমিক আন্দোলনের বামপন্থীতে বিশ্বাসী এক নেতা। ফলে সাধারণ চাষি বা শ্রমিকদের কূপমণ্ডূকতা থেকে, ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি থেকে কমিউনিস্ট নেতারাই তাদের উদ্ধার করতে পারে, এই কথাটাই বারংবার ঘুরে ফিরে এসেছে তাঁর 'মজদুর' উপন্যাসে। আর সমরেশ বসু স্পষ্টতই জানিয়েছিলেন— "আমি জীবনকে নানা দিক থেকে দেখেছি। সবই পার্টির কল্যাণে। একদিকে শ্রমিক অন্দোলন, পার্টি সংগঠন.....। .... মনে আছে সকাল থেকে সন্ধে অবধি চাকরি করে, বাড়ি ফিরে কারখানার পোশাক বদলে, খাবার খেয়ে চলে যেতুম জগদ্দল পার্টি অফিসে, নয়তো ইউনিয়ন অফিসে।"

—সমরেশ বসু : প্রসঙ্গ ভারতীয় কমিউনিস্ট (অখণ্ড) পার্টি ও আমি : দেশ ২২:১১:১৯৮৬, পৃ: ৬৫

স্বাভাবিকভাবেই তাই কাহিনি বিন্যাসে, শ্রমিক চরিত্র নির্মাণে লেখকের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সক্রিয় হয়েছে।

গ. শ্রমিক জীবিকায় আন্দোলন-সংগ্রামের অনিবার্যতা ও নেতৃত্ব ঃ

শ্রমিক জীবনচর্যাকে উপন্যাসে খুঁজে পেতে গেলে অবশ্যই লেখকের এ বিষয়ের নিবিড়-নৈকট্য আবশ্যিক। শ্রমিকদের দুরবস্থার মূল জায়গাটি যে লেবার ও ক্যাপিটালের দ্বন্দ্ব সে বিষয়ে লেখক সহানুভূতি সহকারে জ্ঞাত। "মজদুর" উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে — নেতারা পাট আইনের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে শ্রমিকদের মধ্যে প্রথম সারির নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে ধর্মঘট শুরু করার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। ইউনিয়নের ভূমিকা ধর্মঘটের ক্ষেত্রে কতখানি তা প্রকাশ পেয়েছে এ মন্তব্যে — "ছোট হলেও গত ধর্মঘটে ইহার কর্মীদের দান যৎসামান্য নয়।" কিংবা সমরেশ বসুর 'ছিন্নবাধা'তে একইভাবে ধর্মঘট, তার কারণ ও প্রতিরোধের জন্য নেতৃত্বে উঠে এসেছে। "চব্বিশ-পরগণা হুগলি - দুটি জেলার সমস্ত চটকলের একই সমস্যা। নয়া মেশিন আসছে। সে মেশিনের

ISSN NO.-2454-1605

উৎপাদনের ক্ষমতা অনেক বেশি। কিন্তু লোকের দরকার অনেক কমে যাবে। দুটি জেলায় প্রায় এক লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হবে। তাকে প্রতিরোধ করবার জন্য, প্রায় সমস্ত জায়গাতেই আঞ্চলিকভাবে সংগ্রাম-কমিটির সৃষ্টি হয়েছে।" আসলে শ্রমিকশ্রেণির এই আন্দোলন, সংগ্রামের অনিবার্যতা, প্রতিরোধ, প্রতিরোধ, নেতৃত্ব সম্পর্কে লেখকের বিশ্বাস ও সহমর্মিতা এই পেশার সঠিক রূপকে তুলে ধরতে সহায়তা করে।

■ ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির বা বিরুদ্ধ গোষ্ঠীজীবনের দ্বন্দ্বঃ

পেশানির্ভর উপন্যাসে নির্দিষ্ট পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিমানুষ কখনই নিছক একক বিচ্ছিন্ন হয়ে অস্তিত্ববান হতে পারে না। তবু সমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের বিরোধ বা দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই চরিত্রটির বিকশিত হয়ে ওঠা। 'চৈতালী ঘূর্ণি'তে বাংলার অভাবী, দুর্বল কৃষকের প্রতিনিধি গোষ্ঠ কলকাতায় এসে শ্রমিক হয়েছে। ধানকল কারখানার মজুর গোষ্ঠর স্ত্রী দামিনীর সঙ্গে বস্তিজীবনের গোষ্ঠীবর্গের মধ্যে দ্বান্দ্বিক টানাপোড়েন ঘটে। পুরনো গ্রামজীবনের মূল্যবোধের বিপরীতে এই শ্রমিকজীবন গোষ্ঠদের কাছে অস্বস্তিদায়ক। দরিদ্রতম ঠিকা শ্রমিক বাউরিদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের সঙ্গে গাঁয়ের গোষ্ঠর লড়াই চলতে থাকে। উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে মজুরিবৃদ্ধির দাবিতে ইউনিয়নের ভেতরেই দুই সম্প্রদায়ের দাঙ্গায় আহত গোষ্ঠর হাসপাতালে মৃত্যু হওয়ার মধ্যে দিয়ে। 'বি.টি. রোডের ধারে' উপন্যাসে সমরেশ দেখিয়েছেন গোবিন্দ ছুতার বা ফোর টোয়েন্টি তার সংগ্রামী মানসিকতা নিয়ে পুলিশের গুঁতোয় প্রায় একক প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে গংয়ের ভিটেতে ফিরে এসে মহামারী মন্বন্তরে স্ত্রীপুত্র সবাইকে হারিয়ে বস্তিতে এসে ছুতোর থেকে গোষ্ঠী রান্নাঘরের রাঁধুনিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বস্তিবাসীদের কাছে সে হয়ে উঠেছে আশ্রয়, স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ জীবনের কান্ডারী। অথচ উপন্যাসের শেষে বস্তি দখল ঠেকাতে গিয়ে এগিয়ে আসা গোবিন্দ বিরুদ্ধ বিরিজামোহনের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের কাছে হার মেনেছে গোবিন্দ। তার পেটে চোরাগোপ্তা ছুরি চালিয়ে দিল কে একজন। লড়াকু মানুষের একক বিচ্ছিন্ন লড়াই ভেঙ্গে পড়ল। শ্রমিক শ্রেণির সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির অভাব ব্যক্তিকে বিরুদ্ধ সমষ্টির কাছে হার মানতে বাধ্য করল। 'মজদুর' উপন্যাসে মাসান একজন চটকল শ্রমিক, ইউনিয়নের উৎসাহী কর্মী। দেরি করে কাজে আসায় তাকে বরখাস্ত হতে হয়, এমন কি তার সমর্থনে অন্যান্যরা প্রতিক্রিয়া জানালে তাদের ছাঁটাই হতে হয়, এমনকি শেষ পর্যন্ত জেলে। ধর্মঘট সংগঠিত করতে বাধ্য হয় তারা। পরিণামে মালিকপক্ষ সংগ্রামী শ্রমিকদের ওপর পুলিশি নির্যাতন চালায়। আসলে শ্রমিক পেশা কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা উপন্যাসে শ্রমিকের সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্ব ঘটে মালিকপক্ষের। এই শ্রেণিগত দ্বান্দ্বিক অবস্থানের জন্য পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াতেই এই পেশার অবয়ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

■ পেশাগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চরিত্রচিত্রণঃ

প্রত্যেক জীবিকারই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণে সহায়তা করে থাকে শ্রমিকজীবন যখন পেশা হিসেবে যুক্ত হয় তখন বিশেষ শ্রেণি চরিত্রও এই পেশাটির সঙ্গে মিলে মিশে যায়। সাধারণভাবে কয়েকটি স্তরকে এক্ষেত্রে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

১. কৃষক থেকে শ্রমিকে রূপান্তর

উপন্যাসের নাম	স্থান	চরিত্র	রূপান্তরের কারণ	পরিণাম
চৈতালী ঘূর্ণী	রায়বঙ্গের গ্রাম	গোষ্ঠ	অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টিতে ফসলহীনতা, জমিদারের শোষণ, জমিদারের চাপরাশিকে খুন, শহরে পলায়ন স্ত্রী দামিনীকে নিয়ে	ধানকলের মজুর আধাশহরে গ্রামের মূল্যবোধের সঙ্গে কুলি বস্তির দ্বন্দ্ব, অবশেষে দাঙ্গায় মৃত্যু। গ্রামজীবনের প্রতি টান।
দর্পণ	ঝুমুরিয়া গ্রাম	বীরেশ্বর	গ্রামে অন্তরিন স্বদেশী সূর্যবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে 'চাষাড়ে' প্রতিবাদী বীরেশ্বরের জেল হয়। তারপর কন্যা রম্ভা সহ শহরে গমন।	কলকাতায় কাঠের কারখানায় শ্রমিক রামপালের সঙ্গে রম্ভার বিবাহের মাধ্যমে সংগ্রামের শরিক। পরিণামে বীরেশ্বরকে খুন করে ধনী হেরম্ব।
বি.টি. রোডের ধারে	শহরের বস্তি	গোবিন্দ	মন্বন্তরে স্ত্রীপুত্রকে হারিয়ে শহরের বস্তিতে সরাসরি শ্রমিক নয়, কিন্তু শ্রমিক জীবনের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ	শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে মালিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ পরিণামে ছুরিকাহত হয়ে মৃত্যু।
নবজীবনের পথে	গ্রাম	বিজয়	অভিজাতদের কৃষকদের ওপর অত্যাচার, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, বোন সীতার অপহৃত, নিহত হওয়া শহরে গমন।	শ্রমিক বন্ধু হরিহরের সংস্পর্শে আসা পরে গ্রামের পাশে দাঁড়িয়ে ত্রাণবন্টন, গ্রামীণ সমাজের নেতৃত্বে ভূমিকা গ্রহণ।

পেশাগত চরিত্র হিসেবে কৃষক, ভূমিহীন কৃষক বা ক্ষেতমজুরেরাই যে ক্রমশ জমিদার মহাজনে অত্যাচারে, ম্যালেরিয়ার নখরাঘাতে ভূমিহীন হয়ে নগদ পয়সা উপার্জনের আশায়, স্বচ্ছল জীবন যাপনে জন্য যেন মরীচিকার হাতছানিতে নানাদিকে সদ্যস্থাপিত কলের দিকে ছুটে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা পূর্ব বিভিন্ন কমিশন, রয়্যাল কমিশন অন লেবার, যুদ্ধকালীন শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টে ভারতীয় শ্রমিকদের কৃষক শিকড়কে যথার্থভাবে স্বীকার করা হয়েছিল। দেখা গেছে গ্রামীন জীবনে মূল যুক্ত থাকা, বিশেষত কৃষকজীবনের সঙ্গে সংযোগ কতগুলো বিশেষ প্রবণতার সৃষ্টি করত। প্রথমত, দ্বৈতসত্তা (চাষি ও শ্রমিক) মজুরদের যথার্থ

শ্রেণিচেতনা বিকশিত হতে দিত না। কৃষক জীবনের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে মালিক ও ম্যানেজারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় ধর্মঘটী শ্রমিকেরা ছড়িয়ে পড়ত এবং সেই সুযোগে আন্দোলন দমন করতে সুবিধে হত। এর বিপরীতে অন্যভাবনাও আছে, তাদের মত কৃষকের গ্রামে নির্ভর করার মত অবলম্বন থাকলে ধর্মঘট চালিয়ে যাবার পণ আরও দৃঢ় হয়। আলোচ্য উপন্যাসে চরিত্রদের গ্রাম ও শহর মিলিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

২. শোষিত নির্যাতিত শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ রূপ ঃ

উপন্যাসের নাম	শোষিত রূপ	সঙ্ঘবদ্ধতা
মজদুর	(একক অথচ শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য) 'যন্ত্রদানবের ক্ষুধার পায়ে দেহের শক্তিকে ক্ষয় করিয়া ফিরিয়া আসে তাহারা-পুঞ্জীভূত ব্যর্থতাই শুধুমাত্র সম্বল।"	'..... অবসন্ন কুলির দল, দলে দলে তাহাদের কুঠুরিতে ফিরিতেছে।'
নবজীবনের পথে	—	'চারিদিকে ইহারা দলবদ্ধ। সবসময়েই ইহারা চলিয়াছে দল বাঁধিয়া, কারখানা হইতে বাহিরে আসে দল বাঁধিয়া - দল বাঁধিয়াই আবার নিশান কাঁধে করিয়াই নিজেদের দুঃখ দুর্দশার প্রতিকার করিতে আগাইয়া যায় বিপুল উদ্যমে।'
বি.টি. রোডের ধারে	"সত্যি, ছাঁটাই যেন শরৎকালের মেঘের মত। কখন আসবে কখন যাবে, আর কি তার কারণে বুঝতে না পেরে যেমন হঠাৎ ফ্যাসাদে বিব্রত মানুষে জানোয়ারে ছোটাছুটি আরম্ভ করে, ছাঁটাইয়ের আচমকা মারটাও আসে তেমনি।	"আজকাল মহল্লায় মহল্লায় যায়, ... তাদের সঙ্গে কারখানা কোম্পানী নিয়ে নানান কথা আলোচনা করে, আস্তে আস্তে সে এখানকার মজুর সংগঠনের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।

শোষিত শ্রমিকের নির্যাতিত ছবির উদাহরণ শ্রমিক-পেশারই একটি দিক। পেশাগত বঞ্চনার শিকার যেমন একক মজুর বা শ্রমিক, তেমনি তাদের মিলিত সঙ্ঘবদ্ধ জীবনও বেঁচে বা টিকে থাকার রসদ দিয়েছে। এই পেশায় শ্রমের তুলনায় কম মজুরী। কারখানার মালিক কর্তৃক খেয়ালখুশিতে ছাঁটাইয়ের ভয় জনিত চাকরির নিরাপত্তাহীনতা — যে দুর্গতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় মানুষগুলোকে — সেখান থেকেই জেগে ওঠে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার অনুভূতি — এবং তা থেকে প্রতিবাদ।

৩. প্রতিবাদঃ

উপন্যাসের নাম	প্রতিবাদী চরিত্র	ঘটনা	প্রতিবাদ
ছিন্নবাধা	অনাথ	'অনাথের শাকরেদ ব্যাচাকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল মিলের দারোয়ানেরা'	অনাথের ডাকে বাইরে বেরিয়ে এসেছি সবাই মিলিত প্রতিবাদে লেবার অফিসারের চর - দারোয়ানরা পালিয়ে গেল।
ছিন্নবাধা	অভয়	মিলে লোক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধতা	গান গেয়ে, গান বেঁধে শ্রমিক জাগরণ, পরিশেষে গ্রেপ্তার বরণ।
বি.টি.রোডের ধারে	গোবিন্দ	বস্তি (শ্রমিক) উচ্ছেদ	বিরিজামোহনকে বস্তি উচ্ছেদে বাধাদান, ছুরিকাহত হয়ে মৃত্যু।

আসলে নির্যাতিত শ্রমিক শ্রেণির ক্ষেত্রে মালিক দ্বারা অত্যাচারিত হওয়ার অনিবার্য এই পেশার মধ্যে লুকিয়ে আছে। আবার এরই পাশাপাশি শ্রমিকদের ভেতর থেকেই উঠে আসে প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ একক — কিন্তু প্রায়শই রূপায়ণে যুক্ত হয়ে যায়, বা ক্রমশ সেই প্রতিবাদ সঞ্চারিত হতে থাকে সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে। এখানে আরও একটি দিক বিচার্য যে সমগ্র প্রতিবাদ আন্দোলনে অনেক সময়েই শ্রমিকদের নেতৃত্ব দান যথাযথ না হওয়ায় ধর্মঘট ভেঙ্গে যায়, আন্দোলন কর্মসূচি আশানুরূপ হয় না। ফলে নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে সমস্যা পেশাগত দিকের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায় এবং সেক্ষেত্রে শ্রমিকদের দাবি আদায়ের বিষয়টিতে সীমাবদ্ধতা থাকে।

৪. নেতৃত্বে অপারগ ও বহিরাগত মধ্যবিত্ত নেতৃত্বকে স্বীকারঃ

পেশাগত বৈশিষ্ট্যের ধারায় শ্রমিক জীবনে আন্দোলন-লড়াইয়ের অনিবার্য বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিতেই হয়। অথচ এরই পাশাপাশি উঠে আসে শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে আত্মসচেতনতার প্রশ্নও। ঐতিহাসিক সব্যসাচী ভট্টাচার্যের মতে [Sabyasachi Bhattacharyya, The Outsiders : A Historical Note' in Asok Mitra (ed.) The truth Unites : Essays in Tribute to Samars Subarnarekha, Cal, 1985] সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনে সম্ভবত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা থেকেই বহিরাগতদের হস্তক্ষেপের শুরু এবং তারা শ্রমিকদের শ্রেণিসচেতনতা বৃদ্ধির কাজে ভূমিকা গ্রহণ করতেন। শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে থেকে নেতৃত্ব গড়ে ওঠার প্রশ্নে সব্যসাচী ভট্টাচার্য 'আলভে'র স্মৃতিচারণা উদাহরণ দিয়েছিলেন, সেখানে 'আলভে' জানাচ্ছেন দশঘন্টা মিলে কাজ করার পর তাঁর পক্ষে ইউনিয়নের কাজ করাটা কতটা কঠিন হয়ে উঠেছিল। 'মজদুর' উপন্যাসে একটি পাটকলের শ্রমিকদের দুর্দশা, মালিকপক্ষের অত্যাচার, ধর্মঘট সংগঠনের চেষ্টা, ধর্মঘটীদের বস্তি থেকে উচ্ছেদ সহ অসংখ্য

ISSN NO.-2454-1605

অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকেরা প্রথমে দ্বিধা জানিয়ে পরে একত্রিত হয়। মাঝে নানা চক্রান্তে ধর্মঘট ভেঙে গেলে কলকাতা থেকে সান্যাল ও আব্দুল বারি এসে নেতৃত্ব দিতে প্রয়াসী হয়, শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করতে বক্তৃতা দেয়। আব্দুল বারি বলে, — "সেদিনকার সেই সাধারণ ধর্মঘটের কথা ভোলনি তোমরা, ভোলনি হয়তো তার সুখ, দুঃখ, ব্যথা বিজড়িত পীড়ন আর ত্যাগের কথা। কিন্তু তার চেয়েও বিরাট ও ব্যাপক একটা সংগ্রাম আমাদের সামনে, আরও দুঃখময়, আরও কষ্টকর....যা একদিন পুঁজিবাদী ও সর্বহারাদের চির দ্বন্দ্বের করবে শেষ মীমাংসা।" আবার 'দর্পণ' উপন্যাসে কৃষ্ণেন্দু শ্রমিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং শেষপর্যন্ত শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে থেকেই চেতনায়িত হবার ও নেতৃত্বদানের বিষয়টিকে সামনে এনেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'চৈতালী ঘূর্ণী' তে দুই চাকুরে সুরেন বাবু ও শিবকালীবাবুর (গান্ধীভক্ত) উদ্যোগে মজুরিবৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিক ইউনিয়ন তৈরি হয় ও ধর্মঘট শুরু হয়। 'বি.টি. রোডের ধারে' তে গোবিন্দ বহিরাগত কিন্তু নেতৃত্বে এগিয়ে আসে। 'ছিন্নবাধা'তে অভয় জেলে গিয়ে যে নেতার সান্নিধ্যে আসে সেই "বড় শিক্ষিত লোক গণেশ বাবু। গোবর্ধন ডাক্তারবাবুর ছেলে।" আর গণেশবাবু অভয় শ্রমিককে শেখায় মালিক, সরকারের সম্পর্ক, সরকারের শ্রেণি চরিত্র, 'ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস', ধন বৈষম্যের গোড়ার কথা আরও কত কী! আসলে শ্রমিক আন্দোলনে বহিরাগত নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী উভয় মহলেই প্রচলিত ছিল। লাজপত রাই (AITUC প্রতিষ্ঠাকালে সভাপতি) আশা রেখেছিলেন যে কিছুদিন বুদ্ধিজীবিরা নেতৃত্ব দিলেও, ক্রমে ক্রমে শ্রমিকেরা নিজেদের মধ্যে থেকেই নেতা নির্বাচন করবে। আবার লেনিন তাঁর What is to be done গ্রন্থে শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কিত নানা কথার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিজীবিদের নেতৃত্ব দেওয়ার কথাও বলেন। পেশাগত দিক থেকে শ্রমিকদের চাওয়া পাওয়া বিষয়ের সঙ্গে এই আন্দোলন, নেতৃত্ব দানের ক্ষমতাও ব্যক্তিচরিত্রকে নির্মাণ করেই শ্রেণিচরিত্রকে আভাসিত করে।

শ্রমিক জীবনকে পেশা হিসেবে কেন্দ্রে রেখে বাংলা সাহিত্যের আরও যে সব উপন্যাসকে স্মরণ করা যেতে পারে তাদের মধ্যে উল্লেখ করা যায় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'মোহনা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শহরতলি'র কথা। ত্রিপর্বের তৃতীয় উপন্যাস 'মোহনা'তে যে খগেনবাবু প্রথম দুটি খণ্ডে আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বের সংকটে আবদ্ধ তিনিই শ্রমিক ধর্মঘটের সংস্পর্শে এসে ধর্মঘটের সাফল্যে মুক্তির অনুভব অন্যরকম ভাবে করেন। শ্রমিক নেতা, শ্রমিক সংগঠন সম্পৃক্ত ঘটনাবলীর ধারায় বিবর্তিত হয়েছেন খগেনবাবু। 'শহরতলী'তেও শ্রমিক সংগঠন, একাধিক শ্রমিক চরিত্র তাদের আবেগ, যুক্তি, ভ্রান্তি, উত্তরণ নিয়েই শ্রমিকশ্রেণিকে তুলে ধরেছে। 'নবসন্ন্যাস'এ টুলু বিপ্লবী এবং খনি শ্রমিকদের সংগঠক।

অসংগঠিত শ্রমিক-কথা ঃ

বাংলা উপন্যাসে অসংগঠিত শ্রমিক কথাও উঠে এসেছে বেশ কয়েকটি উপন্যাসে। ছোট কারখানায় যেখানে মালিক ও শ্রমিক একজনই এবং সেক্ষেত্রে শ্রমিক চরিত্রই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা' উপন্যাসের অনিরুদ্ধ কর্মকার। পুরোনো বিনিময়প্রথা ধানের বদলে গ্রামের মানুষের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম তাকে করে দিতে হত। অনি কামার ক্রোধী, প্রতিবাদী, ছিরুপালের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দেবু ঘোষের পাশে থাকে। সমরেশ বসুর 'সওদাগর' উপন্যাসে মেঘনাথ দেশভাগ, শ্রমিক বিক্ষোভ, জটিল রাজনীতির প্রেক্ষিতে শ্রমজীবী বা কারিগর জীবনের উদ্দেশ্যে নিজের যাত্রা শুরু করে একটি বিস্কুট কারখানার স্বপ্ন নিয়ে। এই কারখানাতেই বেকার শ্রমিকেরা ভাড়াঘর ছেড়ে দিয়ে কাজে যোগ দিয়েছে। আর এক চরিত্র বিজয় স্বাধীন দেশে শ্রমিক হিসেবে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবির লড়াইয়ে কমরেডদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়।

অন্য শ্রমিক — অন্য কথা ঃ

১৯৯১ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'রসিক'। মানভূম বা পুরুলিয়ার রুক্ষ পাথুরে জমিতে বিনোদনের উপকরণ ঝুমুর গান। আর এই গানকে কেন্দ্র করেই শিল্পকলার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত রসিক-নাচনি। এই পেশায় রসিক নাচনিকে নাচ গান শিখিয়ে জনগণের সামনে আসরে তা পরিবেশন করিয়ে অর্থ উপার্জন করে। আর এর বিনিময়ে নাচনি রসিকের পরিবারে ভাতকাপড়ের নিশ্চিন্ততায় তার শ্রম উজাড় করে দেয়। প্রেমের সম্পর্কের আপাত আচরণের ভেতরে আসলে লুকিয়ে থাকে এক গভীর শোষণ। ঘরের সব কাজ, প্রয়োজনে চাষের কাজে ক্ষেতমজুরের কাজও। আর প্রাপ্তি ভাতের হাঁড়ি ছুঁতে পারে না, মৃত্যু হলে পরিবার-পরিত্যক্ত হয়ে ডোম পায়ে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যায় চরম অসম্মানের সঙ্গে। বৃদ্ধ হলেও অবাঞ্ছিত, মূল্যহীন এই নাচনি বোঝা হয়ে ওঠে রসিকের পরিবারে। পরিষেবা ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক বিন্যাসে এই শিল্পী আসলে শোষিত শ্রমেরই প্রতীক। ২০০৭ এর একটি সমীক্ষা অনুযায়ী এখনও পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড ও ওড়িশা মিলিয়ে প্রায় ৭৩ জন এই পেশায় যুক্ত আছেন। এর মধ্যে পুরুলিয়াতেই আছে প্রায় ৫০ জন (উৎস : পুরুলিয়ার লোকশিল্প ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গ; পশ্চিমবঙ্গ/পুরুলিয়া জেলা সংখ্যা, জুন ২০০৭)। এই উপন্যাসে কুসমী, নিশারানী, মঞ্জুরানী, বিজুলিবালারা এইভাবেই রসিকের সংসারে নাচ গানের মধ্যেও শোষিত হয়েছে। বাস্তবে 'মানভূম লোকসংস্কৃতি ও নাচনি উন্নয়ন সমিতি' এই নাচনিদের পাশে থেকে দীর্ঘদিন ধরে দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য লড়াই করে। শেষপর্যন্ত ২০১৭ সালে তৎকালীন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বয়স্ক নাচনিদের জন্য পেনশন, নাচনির ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার সুযোগ দান করে। সমিতির সভানেত্রী পোস্তবালা দেবী মনে করেন, "এ যেন বহুযুগ পরে অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরা" (উৎস : আনন্দবাজার পত্রিকা / ১১.১০.২০০৭)

শেষকথা

জীবিকা বা পেশা হিসেবে শ্রমিকশ্রেণি তার স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলা উপন্যাসে মোটামুটিভাবে প্রতিফলিত। শ্রমিক হিসেবে একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র সর্বাঙ্গীণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে শিল্পসফল উপন্যাসে উঠে এসেছে এমন উদাহরণ বিরল। কিন্তু উপন্যাসগুলোতে শ্রমিকশ্রেণি এবং শ্রমিক চরিত্রদের পর্যালোচনা করলে এ দেশীয় শ্রমিকশ্রেণি ও শ্রমিক আন্দোলনের কাঠানো বা রূপরেখাকে খুঁজে পাওয়া যায়। বাস্তবজগতে শ্রমিকশ্রেণি, তাদের পেশাগত বৈশিষ্ট্য, ক্রিয়াকলাপ যখন যেভাবে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে রূপ পেয়েছে তা উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। শ্রমিকজীবনের দুর্দশা, শোষণের চিরন্তনতা যেমন সত্য তেমনি শ্রমিকদের বিদ্রোহ, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার যে শ্রেণিগত চরিত্র এমনকি ধর্মঘট ভাঙার চক্রান্ত, সংগঠনের দুর্বলতায় আন্দোলন ব্যর্থ হওয়া, ছাঁটাই, লকআউটের মত বিপন্নতা, নেতৃত্বের অভাব, বহিরাগত বুদ্ধিজীবীদের সাহচর্য এ সব কিছুই ভারতীয় সমাজ-দ্বন্দ্ব, সমাজ বিপ্লবের অংশ হয়েছে। সাহিত্যিক চরিত্র হিসেবে শ্রমিক চরিত্রগুলি নিজস্ব শ্রেণির স্বার্থের শুধু প্রতিনিধিত্ব করেনি একই সঙ্গে জনগণের সাধারণ স্বার্থের প্রতিনিধিত্বও করেছে। চরিত্ররা একক বিশিষ্ট না হয়ে সমাজবিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে একথাও ঠিক শ্রমিকশ্রেণির পেশাগত বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য শিল্পে রূপায়িত হওয়ার জন্য প্রজ্ঞা, সমাজ ও অর্থনীতির গভীর কথা আত্মস্থ বা স্বীকরণের আবশ্যিকতাকে উপন্যাসে যতই প্রয়োগ করা যাবে ততই সঠিকভাবে এই পেশা প্রতিফলিত হতে পারে। আর এই ক্ষেত্রেই প্রকট হয়েছে এ বিষয়ে শিল্প সার্থক উপন্যাসের সীমাবদ্ধতা।

ISSN NO.-2454-1605

গ্রন্থসূত্র ঃ

- রবীন্দ্র রচনাবলী - পশ্চিমবঙ্গ সরকার, নভেম্বর, ১৯৮৩
- ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি (অখণ্ড) ও আমি - সমরেশ বসু, নভেম্বর, ১৯৮৬
- উপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় - সরোজ দত্ত
- শ্রমিক বা শ্রমজীবী জীবিকা প্রতিফলিত হয়েছে এমন কিছু উপন্যাস নির্বাচন করা হয়েছে। এগুলি হল ঃ

উপন্যাসের নাম	লেখকের নাম	প্রকাশকাল
চৈতালী ঘূর্ণি	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৩১
মজদুর	বিশ্ব বিশ্বাস	১৯৩৯-১৯৪০
নবজীবনের পথে	মনোরঞ্জন হাজরা	১৯৪৬
দর্পণ	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৪৫
নবসন্ন্যাস (২ খণ্ড)	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	১৯৪৮
বিটি রোডের ধারে	সমরেশ বসু	১৯৫২
সওদাগর	সমরেশ বসু	১৯৫৬
ছিন্নবাধা	সমরেশ বসু	১৯৬২

পত্রিকা ঃ-

- ভারত শ্রমজীবী, মে, ১৮৭৪
- বাঙ্গালার শ্রমিক, ১ম সংখ্যা, ১৯৩৪
- অমৃতবাজার পত্রিকা, ৩১.১০.১৯২৮
- দেশ সাহিত্য সংখ্যা - ১৯৭৫
- আনন্দবাজার পত্রিকা - ১১.১০.২০০৭